ইসলামের দৃষ্টিতে তাসাওউফের প্রকৃতি ও পরিধি : একটি পর্যালোচনা

আ. র. ম. মোস্তফা*

Abstract: A discourse on the authenticity of Sufism in Islam has been going on. Scholars are divided on the opinions while it is in favour or reject unto this penamena. Some of them say that it is none Islamic which is derived from none Islamic sources while others accepted it as pure Islamic mysticism. Along with, there is a also debete about this Sufism, where some of them defined it as spiritual process to develope the inner sides of human life while others expressed it at behaviour aspects. On that discourses there are differnt veiws about the nature and scope of Sufism in Islam. This paper will discuss these issues to determine the nature and scope of Sufism in Islam.

ভূমিকা

তাসাওউফ প্রত্যয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধারায় আলোচনা পর্যালোচনা রয়েছে। এমনকি তাসাওউফ শব্দটির অর্থ ও সংজ্ঞা নির্ধারণেও প্রচুর মন্তব্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। কারো মতে এটি আত্মশুদ্ধি প্রক্রিয়া, এর পরিধি মানুষের আত্মা। কারো মতে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন প্রক্রিয়া বিশেষ, এর পরিধি মানুষের আত্মা ও চরিত্র। কারো কারো মতে বিশ্বের প্রতিটি ধর্মে তাসাওউফ রয়েছে। এজন্য এর প্রকৃতি ও পরিধি ব্যাপক। এর প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারণে মুসলিম আলিমগণের মাঝেও বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। অনেকের মতে এটি কুরআন সুন্নাহ ও মুসলিমদের জীবনাচার থেকে উৎসারিত। কারো মতে এটি অনৈসলামিক উৎস থেকে নির্গত বা সেসব উৎস দ্বারা প্রভাবিত। অধুনা কেউ কেউ ইসলামী সমাজে বিদ্যমান তাসাওউফকে দুই ধরনে বিভক্ত করেন। একটি হলো: সুন্নী তাসাওউফ, এটি ইসলাম সম্মত এবং ইসলামের তাযকিয়াতুন নাফস প্রক্রিয়ার অি-ভসংযোজন, অপরটি হলো : দার্শনিক তাসাওউফ, যার অনেক কিছু ইসলাম সম্মত হতে পারে না। এভাবে বিভিন্ন রূপের বা ধরনের তাসাওউফ বিরাজমান। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে তাসাওউফের প্রকৃতি ও পরিধি কী? এর বিভিন্ন দিক কুরআন সুন্নাহের আলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে উপস্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত আঙ্গিকে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত : তাসাওউফের শাব্দিক ব্যাখ্যাটি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ
দ্বিতীয়ত : তাসাওউফ আধ্যাত্মিক, না চারিত্রিক, না উভয়টি
তৃতীয়ত : তাসাওউফের বিভিন্ন ধরন : সুন্নী তাসাউফ ও দার্শনিক তাসাওউফ
চতুর্থত : তাসাওউফ ইসলামী ভাবধারা থেকে উৎসারিত, না অনৈসলামিক উৎস প্রভাবিত

* আ. র . ম. মোস্তফা, এমফিল গবেষক, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

নিম্নে এ বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হলো:

ক. তাসাওউফের শাব্দিক ব্যাখ্যাটি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

কোন একটি বিষয়ের প্রকৃতি নির্ধারনে এর শাব্দিক পরিচয় অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। 'তাসাওউফ' (تصوف) শব্দটি আরবী । এ تصوف শব্দটির মূল নির্ধারণে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। যার ক'টি নিম্নরূপ:

১. কারো মতে তাসাওউফ মূল ধাতু (صوف) 'আস্-সূফ' থেকে নির্গত। যার অর্থ পশম। সূফ (পশম) শব্দ থেকে সূফী শব্দের উদ্ভব ঘটেছে এ মতের সমর্থন করেন তাসাওউফ বিদ ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী, আল-কালাবাদী, (মৃ. ১০০০ খৃ.), আর-রুদবারী, (মৃ.১০৭২ খৃ.), ইবনে তাইমিয়া, (মৃ.৭২৮ হি.), মি: নোলডেক, (মৃ. ১৯৩০ খৃ.), প্রফেসর নিকল্সন, (মৃ. ১৯৪৫ খৃ.), ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী (র.) (মৃ.৪৬৫ হি.) বলেন, تَصَوَّف اِذَا لَبَسَ الصَّوْفُ كَمَايُقَالُ تَقَمَّصَ اِذَا لَبَسَ الْقَمِيْصُ যখন কেউ পশমের পোশাক পরিধান করে তখন تَصَوَّف ً বলা হয়, যেমন تَقَمَّص বলা হয় যখন কেউ জামা পরে "। (আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি., ২ : ৪৬৪)। এ ব্যাখ্যায় বলা হয়: যিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে পশমী পোষাক পরিধান করেন, তিনিই সূফি। ইব্ন খালদুন, (মৃ.৬৭০/১৩৪৯ খৃ.)সহ কয়েকজন আলিমের উদ্বৃতিতে সায়্যিদ আবদুল হাই উল্লেখ করেন, The word sufi is derived from the word `suf: meaning wool. So by a sufi is mean a person who out of choice uses clothings of the simplest kind and avoids every form of luxary and ostentation'. (Abdul Hai, 1982: 141; ইব্ন খালদুন, ১৯৮৮খ্রি : ১৪৬-৭; Arberry 1974, 2: 253).

২. কারো মতে তাসাওউফের মূল ধাতু (الصفاء)'আস্ সফা'। যার অর্থ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা।[৫] এই মূল ধাতুর ভিত্তিতে যে কোন জিনিসকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করার নামই তাসাওউফ। এ মতের অনুসারী হলেন মোল্লা জামী (মৃত ১৪৯২ খৃ.) ও তাঁর অনুসারীগণ। তাঁদের মতে: ''আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের জন্য প্রয়োজন আত্মিক পবিত্রতা। এ উদ্দেশ্যেই সূফীগণ আত্মার পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করতেন বলে তাদেরকে সূফী বলা হয়।'' সরকার ১৯৮৪ খ্রি. : ২ ; বখ্শ, ১৯৯৯ খ্রি., : ৪৬)। তাসাওউফ শব্দটি যদি اَلصَّفَا (আস্-সফা) থেকে নির্গত হয়, তাহলে তাসাওউফ থেকে উদ্দেশ্য হবে এমন জীবন-পদ্ধতি যা মানুষের অন্তরকে অন্ধকার এবং পাপপঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে দেয়। পাপাচারের মরিচিকা মনের আয়না থেকে মুছে দেয়। ফলে ভিতর থেকে অলসতা ও অবাধ্যতার অবসাদ কাটিয়ে হৃদয়কে ঝকঝকে ও মসৃন করে দেয়। তখন সেই অন্তর হয় ঐশী আলোর উদয়স্থল। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা এভাবে এসেছে كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىٰ قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْن (আল কুরআন, সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন : ১৪ ।) নবী করীম (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন :

اَلْمُؤْمِنُ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَة سَوْدَاءَ فِيْ قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبَهُ مِنْهَا وَ اَنْ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوْ قَلْبُهُ فَذَالِكَ الرَّانَ الذِّىْ ذَكَرَ اللهُ فِىْ كِتَابِهِ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىٰ قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْن

যখন কোনো মুমিন বান্দা গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ লেগে যায়। অতপর যখন সে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন সে-কালো দাগটি মুছে গিয়ে অন্তর ঝকঝকে সুন্দর হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে আরো বেশি গুনাহ করতে থাকে তখন সে-কালো দাগটি

বাড়তে থাকে। এই কালো দাগের কথা আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন উপরোক্তভাবে। (শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, ১৯৭৬খ্রি. : ২০৪)।

৩. তাসাওউফ শব্দটি اَلصُّفَّة (আস্-সুফ্ফা) পরিভাষা থেকে নির্গত। 'আহলুস্ সুফফা' প্রায় ৭০ জন সাহাবী, যাঁরা মাসজিদে নববীতে এক ছাদ বিহীন প্রকষ্ঠে অবস্থান করতেন। রাসূলে করীম (সা.) তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। (আল-বুখারী , ১৯৮৫ খ্রি.: ৯৫৫; আল ইসফাহানী ১৯৯৭ খ্রি, ১: ৩৩৭, ৩৪১, ৩৭৫, ৩৭৭; ইমাম আহমদ, ১৪১৪ হি., ২: ৮, ৫১৫)।

৪. তাসাউফ اَلصَّفُّ (আস্-সফ্) থেকে নির্গত। যার অর্থ শ্রেণী, সারি, কাতার ইত্যাদি।[১১] 'যাঁরা আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা, আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও ধর্ম চর্চার দিক দিয়ে আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদায় অবস্থান করেন, তাঁরাই সুফী'। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল কাশেম আল কুশাইরী বলেন, اِنَّهُ مُشْتَقّ مِنَ الصَّفِّ فَكَاَنَّهَا فِىْ الصَّفِّ الْاَوَّلِ بِقُلُوْبِهِمْ কারণ সূফীদের অন্তর যেন আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হিসেবে গণ্য। (আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি., ২ : ৪৬৪)।

৫. 'সূফী শব্দটি গ্রীক 'থীউ সুফি' (Theosophie) শব্দ থেকে এসেছে। গ্রীক ভাষায় এ শব্দটির অর্থ প্রভু-জ্ঞান। কেননা সূফীও প্রভুর জ্ঞান-সাধনায় মশগুল থাকেন। যিনি প্রকৃত অর্থেই সূফী, তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্ঠা ও সৃষ্টি কৌশলের মর্ম উদঘাটনে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকেন। ড. আর.এ.নিকলসন (মৃ. ১৯৪৫ খৃ.) তিনি এ মতের সাথে একাত্মতা পোষণ করে দাবী করে থাকেন যে, 'সূফী' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'সোফিষ্ট' থেকে আগত। যার অর্থ 'জ্ঞান'। তিনি বলেন, সূফীরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাগর। সুতরাং 'সোফিষ্ট' শব্দ থেকেই সূফী শব্দের উৎপত্তি।' ড. নিকলসন (মৃ. ১৯৪৫ খৃ.) সূফী শব্দের উৎপত্তি 'সোফিষ্ট' শব্দ সম্পর্কে জোর তাকীদ দিলেও অন্যান্য শব্দ যেমন, 'সুফিয়া' (জ্ঞান), 'সাফা' ও 'সুফ' (পবিত্রতা) ও (পশম) সম্পর্কে ধারণা অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে, 'তিনটি শব্দের সমন্বয়ে সূফী শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। (Deboar, 1961; Nichloson,1967: 18; Arberry,1969).

বস্তুত, তাসাওউফ এর যাত্রা শুরু আল্লাহর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। তাঁর মাহাত্মকে অন্তরে ধারন করে সে অন্তরের কালিমা বিদূরিত করে আত্মা ও আচার আচরণ পরিশুদ্ধকরণ হলো তাসাওউফ। এ দৃষ্টিকোণটি আল কুরআনের তাযকিয়াতুন নাফসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ দৃষ্টিকোণটি গ্রহণ করলে 'তাসাওউফের উপরোক্ত অর্থসমূহের মাঝে কোন বৈপরিত্য থাকে না।

আর মহানবী (স.) ও পরবর্তী দুটি যুগে তথা সাহাবী ও তাবেঈগণের যুগেও এ শব্দটি আরবী ভাষায় প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হিজরী দ্বিতীয় শতক তথা খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার জাবির ইবন হাইয়্যান ও আবু হাশিম (মৃ. ১৫০হি.) নামক সাধকের নামে সর্বপ্রথম সূফী শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যখন গ্রীক দর্শনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বিরাজমান ছিল বিশেষত প্রথম আব্বাসীয় যুগে, তখন তাসাওউফ বা সূফী শব্দটির প্রচলন ঘটে। এজন্য হয়ত উক্ত শব্দটি গ্রীক মূল প্রভাবিতও হতে পারে। এ দাবীটি অনুমান ভিত্তিক। সূফীগণের দৃষ্টিতে এটি সফা (صفاء) থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ পরিশুদ্ধতা অর্জন। তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্যও পরিশুদ্ধতা অর্জন।

কেউ কেউ দাবী করেছেন, খ্রিস্টান পাদ্রীদের মধ্যে কৃচ্ছতা অবলম্বনকারীদের ন্যায় প্রাথমিক যুগের সূফীগণ পশম পরিধান করতেন। প্রখ্যাত মুহাম্মদ হাম্মাদ ইবন সালামাহ (মৃ. ১৫৭হি.) একদা আস সাবাহী নামে দুনিয়ার ভোগবিলাসবিমুখ ও পশমী পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে বলেন, "তোমার মাঝে থাকা নাসরানিয়্যাতের বেশভুষা পরিহার করো।"(ضع عنك نصرانيتك هذه) (ইবন আবদি রাব্বাহ, ১৪১১হি., ৪ :

২৬২)। এজন্য দাবী করা হয়, সূফ (صوف) তথা পশম পরিধানকারী হলো সূফী। প্রাচ্যবিদ নিকলসনও এ দাবীটি সমর্থন করেছেন। (Nicholson, 1967: 18) তবে এ দাবীটি সমালোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, অর্থটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পশমী পোশাক পরিধান করা হয় শীতকালে। এটি সর্বকালীন পোশাক নয়। তাছাড়া, এটি সূফীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। অন্যরাও এটি পরিধান করে।

সুতরাং তাসাওউফ 'সফা' থেকে উৎসারিত - এ দাবীটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণের সাথে সাজুয্যপূর্ণ। কারণ তখন এটি তাযকিয়াতুন্নাফস বা নাফস (আত্মা ও মন) এর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার সাথে মিলে যাবে। এমনিভাবে চারিত্রিক শুদ্ধিতাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ. তাসাওউফ আধ্যাত্মিক, না চারিত্রিক, না উভয়টি

উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মিক দিক বলতে বুঝায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আর চরিত্রের সাথে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সম্পর্ক সুনিবিড়। ইমাম আবু হামিদ আল- গাযালী বলেন, "খুলুক হলো মনের এমন অবস্থা যা সুলুক তথা বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে বহি:প্রকাশ ঘটে থাকে।" সুতরাং আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে তাদের মন উৎকর্ষিত হয় এবং তার ভিত্তিতে চারিত্রিক সংশোধন হয়। এ দিকগুলো একে অপরের সাথে গভীরভাবে নিবিষ্ট। কিন্তু তাসাউফের পারিভাষিক সংজ্ঞা ও স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ধারন যে সব মতামত এসেছে, সেখানে দেখা যায়, কোনটির দৃষ্টিতে তাসাওউফ বলতে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন বুঝায়। যা ঘটে থাকে, মা'রিফাতুল্লাহ তথা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে। আবার কোনটির দৃষ্টিতে তাসাওউফ মানে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন বুঝায়। এ দৃষ্টিতে তাসাওউফের প্রকৃতি ও পরিধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। নিম্নে তাসাওউফের কর্ণধার কিছু আলিম থেকে বর্ণিত এ ধরনের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত : তাসাওউফ মানে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ:

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচুর সংজ্ঞা ও মন্তব্য এসেছে। যেমন:

১. হযরত মারূফ কারখী (রহ.) (মৃত ২০০ হি.) বলেন, তাসাওউফ হচ্ছে আল্লাহর সত্তার উপলব্ধি।" (আফিফী, ১৯৬৯ খ্রি., : ২৮।)
২. বাশার-ই-হাফী (রহ.)[১৮] (মৃত ২২৭ হি.) বলেন, ''আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করাকে তাসাওউফ বলে''। (আফিফী, ১৯৬৯ খ্রি., : ২৯।)
৩. যুননূন মিসরী (রহ.) (মৃত ৮১৫ খৃ.) আল্লাহ ছাড়া সবকিছু বর্জন করাই তাসাওউফ।"(আত্তার, ১৪১১ বাং, ১: ২৬।)
৪. হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) (মৃত ২৯৭ হি.) বলেন, التصوف هو ان يكون مع الله بلا علاقة (তাসাওউফ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হওয়া এমনভাবে অন্যসব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে।") (আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি., ২: ৪৬৫)
৫. শায়খ হুজুওয়াইরী (মৃ. ৪৬৫হি.) স্বীয় গ্রন্থ 'কাশফুল মাহজুব' শায়খ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল মুকরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তাসাওউফ হলে পরম সত্য আল্লাহ তা'আলার সাথে বিভিন্ন অবস্থার স্থিরতা"(التصوف استقامة الأحوال مع الحق تعالى)। (হুজুওয়াইরী, ১৪১২হি.,১:২৩৬-২৩৭)

৬. ইমাম গাযালী (রহ.) (মৃত ৫০৫হি./ ১১১১ খ্রি.) বলেন : ''আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে সর্বপ্রকার বাতিল ধ্যান- ধারণা থেকে মননকে মুক্ত করে নিষ্ঠার সাথে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম অর্জন করাকে তাসাওউফ বলে।'' (আলম, ১৯৯৪খ্রি. : ৩৫৯)

দ্বিতীয়ত : তাসাওউফ মানে চারিত্রিক সংশোধন ও উৎকর্ষতা লাভঃ

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচুর সংজ্ঞা ও মন্তব্য এসেছে। যেমন:

১. হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة نزوات النفس ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة তাসাওউফ মানে জাগতিক প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে অন্তর পরিশুদ্ধকরণ, স্বভাবসিদ্ধ আখলাকের বিরোধিতা করা থেকে অন্তর মুক্ত রাখা, মানবীয় গুণাবলীর দমন থেকে বিরত থাকা, মনের প্রেষণা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার অবস্থান ধারন করা, হাকীকতের ইলমসমূহের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং শারী'আহর ক্ষেত্রে রাসূল (স.) এর অনুসরণ করা।" (আল শাফে'ঈ, ২০০৭খ্রি. : ২৫-২৬।)

২. আবু বকর আল কাত্তানী (মৃ. ৩২২হি.) বলেন : التصوف خلق فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك قى الصفا (তাসাওউফ মানে চরিত্র, যার মধ্যে চারিত্রিক গুণ বেশি অর্জিত হবে তার মধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধতা ততবেশি পরিলক্ষিত হবে)। (আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি., ২: ৪৬৬; আল শাফে'ঈ, ২০০৭খ্রি. : ২৫)

৩. মুহাম্মদ আজ-জারিরী (মৃত ৩১১ হি.) বলেন, التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى و الخروج من كل خلق دنى (সার্বিক সুন্দর চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ঠ হওয়া এবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলী থেকে মুক্ত থাকার নামই তাসাওউফ)। "(আত- তূসী, ১৯৬০খ্রি.: ৪৫)।

৪. শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী (র.) (মৃ ৯২৬হি.) বলেন, التصوف علم تعرف به احوال تزكية النفوس وتصفية الاخلاق و تعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الابدية

(তাসাওউফ এমন শাস্ত্রের নাম যা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় মানুষের মন ও চরিত্র পরিশুদ্ধকরণের এবং মানুষের ভেতর ও বাইরের জীবন গঠন করণে বিভিন্ন অবস্থাদি, যাতে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জিত হয়।) (আনসারী, ১৪১০হি., ১: ১০৪)।

বস্তুত দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে হলো তাসাওউফ। এটি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন উভয়টি মিলেই তাসাওউফ। এজন্য হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) (মৃত ১১১৬ হি.) বলেন- 'তাসাওউফ হলো-খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন ও বান্দার সাথে সু-আচরণের নাম। (জিলানী, ২০০৬ খ্রি. , ১: ৩৫৪।)

উপরোক্ত দুটি ধারার সমন্বয় ইসলাম সম্মত। আল কুরআনেও বিষয়টি নিম্ন বর্ণিত আয়াতে এসেছে:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

" আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারীদের সাথে রয়েছেন।"(সূরা আল আনকাবূত : ৬৯)

এ আয়াতে আল্লাহকে পাওয়ার পথের সন্ধানী মূলত আধ্যাত্মিক সফরকারী। সাথে তিনি সদাচারকারীদের সাথে রয়েছেন বলে আখলাকের কথা উল্লেখ করা হয়। এখানে তাসাওউফের উভয় দিকের সমন্বয় ঘটেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহব্বত পাওয়ার জন্য যখন বান্দা চেষ্টা করতে করতে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করে, তখন এক পর্যায়ে সে আল্লাহর বন্ধুত্ব তথা বিলায়েত লাভ করতে থাকে। এজন্য পরিপূর্ণ আত্ম-সমার্পণের মাধ্যমে বিলায়াত অর্জন পূর্বক পরম সত্তার (যাত) স্থিতি (বাকা) লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করা সূফী সাধনার মূল বিষয়বস্তু।

গ. তাসাওউফের বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি : সুন্নী তাসাওউফ ও দার্শনিক তাসাওউফ

সুন্নী তাসাওউফঃ

মুসলিম সমাজে তাসাওউফের বিভিন্ন ধরনের উদ্ভব ঘটেছে। ইসলামী সমাজে তাসাওউফের উন্মেষ হয় মূলত ইসলামের যুহদ নীতি তথা দুনিয়ার ভোগ বিলাস বিমুখ চেতনায় আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্রত নিয়ে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করার জীবনাচার থেকে। যা তাযকিয়াতুন নাফসের নবতর রূপ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষত হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) ও কিছু কিছু তাবেঈর মাঝে উক্ত যুহদ প্রবণতা দেখা দেয়। সাহাবীগণের মধ্যে আবু যর গিফারী (রা.), তামীম আদ দারী (রা.) এবং তাবেঈগণের মধ্যে হযরত হাসান বসরী (রহ., মৃ. ১১০হি.), পরবর্তীতে ইবন আদহাম (মৃ. ১৫৯হি.), রাবে'আহ আল বসরী (মৃ. ১৮৫হি.) প্রমুখ এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ চেতনা বা প্রবাহটি ইরাকের বসরা ও মিসরে ব্যাপক প্রসার ঘটে। পরবর্তীতে তথা দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝিতে রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে দূরে থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খা নিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধন তথা তাযকিয়াতুন নাফস প্রক্রিয়া অবলম্বন করার নীতি গৃহীত হয়। যাকে ফিকুহুল বাতিন , ইহসান তথা সুন্নী তাসাওউফ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের নীতি ছিল ইসলামের তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের আকীদা ও চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে। এর জন্য সূফী মাশাইখ বিভিন্ন মুকাম ও হালাতসমূহের ধারণার উন্নয়ন করেন। যা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর এগুলোই এ ধরনের পরিধিভুক্ত। এর মুকামগুলো মধ্যে : আল্লাহর মহব্বত, যুহদ, ইস্তিকামাহ, সত্যবাদিতা, যিকরুল্লাহ, তাওয়াক্কুল, আল্লাহভীতি, সবর, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাওবাহ, ইস্তিগফার, মুজাহাদা, মুরাকাবাহ, মুশাহাদাহ, আল্লাহর সাথে চিন্তাভাবনা ও মুনাজাতে একাকিত্ব, রাসূল স. এর ইত্তেবা ইত্যাদি রয়েছে। হালাতসমূহের মধ্যেঃ আশান্বিত হওয়া, বিনয় ও আল্লাহ ভীতি, ইখলাস বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা, একাকীত্বে ইবাদাত, কাশফ ও ইলহাম, ফানা ফিল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ) ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এসব আধ্যাত্মিক ও আখলাকী বিষয়ের প্রতি কুরআন হাদীছে সমর্থন ও নির্দেশনা রয়েছে। যেজন্য তাসাওউফের বিরোধিতাকারীগণও উল্লেখ করেছেন যে, এধরনের তাসাওউফপন্থী মাশায়েখ কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সালাফে সালেহীনের জীবনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যেমনঃ জুনায়েদ বাগদাদী, আবদুল কাদির জীলানী, পরবর্তীতে ইমাম আবূ হামেদ গাযালী প্রমুখের তাসাওউফী চেতনা। এধরনের তাসাওউফকে **'সুন্নী তাসাওউফ'** হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সুন্নী তাসাওউফের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো তাযকিয়াতুন নাফস। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا }

"কসম নাফ্সের এবং যিনি তা সুসম করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফ্স) কে কলুষিত করেছে।" (সূরা আল শামস : ৭-১০)।

আর মহানবী (স.) এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল তাযকিয়াতুন নাফস ও ওয়াস সুলূক। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}

তিনিই উম্মীদের[১] মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত।" (সূরা আল জুমুআ : ২)। এভাবে আল্লাহর মুহব্বত, ভীতি, অল্পে তুষ্টি, সবর ইত্যাদি মুকামসমূহ এবং হালাতসমূহ মুমিন জীবনে অনুসরণ করা সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। এমনিভাবে একাগ্র চিত্তে আল্লাহর ইবাদত ও জ্ঞান সাধনার জন্যও ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন আসহাবে সূফফা কর্তৃক দারিদ্রকে উপেক্ষার ও আর্থিক কষ্টসহিষ্ণুতার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। সাথে সাথে তাদের আলোকিত অন্তর ও আমলী কৃতিত্বের বিষয়ও বিধৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করা হয়েছে: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدَعُوْنَ رَبَّهُم بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ ''আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ডাকে তথা তাঁর ইবাদত করে। (আল-কুরআন, সূরা কাহফ : ২৮।)

বর্ণিত আছে, আয়াতটি আসহাবে সুফফা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এভাবে আধ্যাত্মিক সফরে মনোনিবেশ করার জন্য আল কুরআনে আহ্বান জানানো হয়েছে:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي

'হে পরিতুষ্ট আত্মা ! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"(আল-কুরআন, সূরা ফাজর : ২৭-৩০।)

এ ধরনের তাসাওউফের পরিধিভুক্ত অন্যতম আরেকটি দিক হলো মারিফাত। মানুষ যখন মা'রেফাতের ইলাহীর সন্ধান পেয়ে যায়। তখন জাগতিক সব কর্মকান্ডের মোহ বিলীন হয়ে যায়। পৃথিবী ও পার্থিব সবকিছু থেকে তার বিতৃষ্ণা এসে যায়। চারদিকের সৃষ্টিকুল দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :"তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।"(আল-কোরআন, সূরা আল-বাক্বারা :১১৫।) বান্দা যেদিকেই তাকায় সেদিকে শুধু তার প্রভূকেই দেখতে পায়। প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল কেবল স্রষ্টা ব্যতিত। এ সত্য তার সামনে ক্রমশ: উদ্ভাসিত হতে থাকে। এভাবে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়। এ ছয়টি বস্তু সমষ্টির নাম মা'রেফাত। আর তা হল: ১. তাযকিয়ায়ে নাফস, ২. অন্তরের পরিশুদ্ধি, ৩. আল্লাহর

[১] উম্মী দ্বারা আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আনুগত্য, ৪. আল্লাহর প্রেম, ৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি, ৬. আল্লাহর পরিচয় বা মা'রেফাত। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) বলেন- প্রথমে যখন তার (প্রভূর) সন্ধানে বের হতাম। তখন নিজেকে ছাড়া কিছুই পেতাম না। এখন তাঁকে ছাড়া আর কিছুই পাই না। এর কারণ হল- বান্দা যখন মা'রেফাতে পূর্ণতা লাভ করে তখন তার দৃষ্টি সীমা থেকে সমুদয় নশ্বর বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্তরে বাহিরে কেবলমাত্র প্রভূকে দৃষ্টিগোচর হয়। এ পর্যন্ত আলোচনার কোন জায়গাতে জড়তা, অর্থবতা ও বৈরাগ্যের কোন কপ্পাও ছিলনা। শুধু আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকার নামই ইলমে মা'রেফাত নয়। বরং এটি একটি কর্ম-সাধনা, ব্যাপক আন্দোলন ও পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বার্তা।

মানুষ তাসাওউফের এসব ধাপ অতিক্রম করার পর মা'রেফাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। তখন প্রভূর সাথে সম্পর্কের সেতু বন্ধনের মাধ্যমে মানুষ মানবীয় সব মর্যাদার স্তর পেরিয়ে এমন এক শীর্ষ চূড়ায় অবস্থান করে যার সামনে কোন মর্যাদার তুলনা চলে না।

জুনায়েদ (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لايقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة

যে কুরআন হিফয করে না ও হাদীছ লিখে না এ তাসাওউফ বিষয়ে অনুসরণযোগ্য নয়। কেননা এ বিষয়ে ইলম অর্জন কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আবদ্ধ।" (আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি., ১:৮০)।

তাসাওউফের বিরোধিতাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.)ও তাদের প্রশংসা করে তাদের জীবন পদ্ধতিকে সালাফে সালেহীনের পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি সূফী মাশায়েখের মধ্যে ফুদাইল ইবন আয়াদ, আবু সুলাইমান আদ দারানী, মারুফ আল কারখী, জুনায়েদ ও সাহাল ইবন আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখ করে বলেন, এদের পদ্ধতি সালাফে সালেহীনের পদ্ধতির সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে। (ইবন তাইমিয়া, ১৪০৩হি.: ৮১-৮২)

দার্শনিক তাসাওউফ:

যে তাসাওউফ চিন্তাধারায় জগত পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গীর মিশ্রন ঘটায় বরং সর্বাত্মবাদ (Pantheism), বান্দার সাথে আল্লাহ একাত্মতা, বান্দার মাঝে আল্লাহর অনুপ্রবেশবাদ ইত্যাদি ধর্মীয় দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে দার্শনিক সূফীবাদ বা দার্শনিক তাসাওউফ বলে। (আল কারাদাভী, ১৯৮৩খ্রি. : ৯৫; আত তাফতাযানী, তাবি, : ১৮৭)। এ ধরনের তাসাওউফের পরিধিভুক্ত আরেকটি বিষয় হলো নূরে মুহাম্মদীকে কাদীম (অনাদি) মনে করা। এ সব সৃষ্টিজগতের ব্যাখ্যার সাথে জড়িত। ড. কারাদাভীর মতে এ দার্শনিক তাসাওউফ মূলত সবটুকুই পরিত্যাজ্য। (আল কারাদাভী, ১৯৮৩খ্রি. : ৯৫)। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে বায়জিদ বুস্তামী (মৃ. ২৬১হি.), মানসুর হাল্লাজ (মৃ. ৩০৯হি.), প্রমুখের মতামতে এর প্রাথমিক বীজ বপন হয়। কিন্তু হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ইবন আরাবী (মৃ. ৬৩৮হি.)একে দার্শনিক রূপ প্রদান করেন। যা পরবর্তীতে অনেক সূফী তরীকায় সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়।

এ ধরনের সর্বাত্মবাদী বা বান্দার দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশকরণ তাসাওউফের প্রবক্তাগণ কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। যেমন কুরআনের আয়াতসমূহ :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ ও গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞানী।" (আল-কুরআন, সূরা মুরসালাত : ৩।)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'এবং আমি (আল্লাহ) মানুষের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটবর্তী।" (আল-কুরআন, সূরা ক্বফ : ১৬।)

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

(আমি আল্লাহ্ অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের সত্তার মধ্যেও। তোমরা কি তা দেখছো না ?" (আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত : ২১।)

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ

'দ্যুলোক, ভূ-লোকব্যাপী তার পবিত্রাসন বিরাজমান।" (আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত : ২১।)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'যখন আমার বান্দারা (হে নবী) আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ..... বস্তুত আমি সন্নিকটে।" (আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৮৬।)

'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটবর্তী আছি। কেউ আমাকে আহ্বান করলে আমি সে আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি।" (আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৮৭।)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

'অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব।(আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৫২।)

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান।(আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১১৫।)'

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ

'..... আমি তার মধ্যে রূহ প্রবিষ্ট করাব।(আল-কুরআন, সূরা হিজর : ২৯।)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল পেশের জওয়াবে বলা হয়, এগুলো দ্বারা আল্লাহর সর্বাত্মবাদ বা অনু-প্রবেশবাদ বুঝানো হয়নি। এসব আয়াতে আল্লাহর নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ হলেন একক ও পৃথক সত্তা, তিনি কাদীম। আর সকল কিছু সৃষ্ট। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট বস্তু এক হতে পারে না। আর মুহাম্মদ স. এর নূর কাদীম বা অনাদি হতে পারেন না, তাঁর সত্ত্বাও অনাদি নয়। তিনি একইসাথে রাসূল বা প্রেরিত ও প্রেরণকারী হতে পারেন না। মানুষের রূহ বা আত্মা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট। এটি অনাদি নয়। এজন্য হকপন্থী সূফীগণ তাওহীদকে তাদের মূলনীতি হিসেবে সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছেন। তাসাওউফপন্থী আলিম জুনায়েদ বাগদাদী বলেন: "তাওহীদ হলো : সৃষ্টকে অনাদি সত্ত্বা থেকে পৃথক করা বিশেষ।" (আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি. , ১: ৮০)।

ঘ. তাসাওউফ ইসলামী ভাবধারা থেকে উৎসারিত, না অনৈসলামিক উৎস প্রভাবিত

উল্লেখ্য, তাসাওউফ ইসলামী হতে পারে কিনা এ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে বিরাজমান তাসাওউফের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত, ইসলামী সমাজে তাসাওউফ কিভাবে ও কোথা থেকে উৎপত্তি হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সূফীবাদে বিশ্বাসীগণ দাবী করেন, তাসাওউফের সব চিন্তা-ধারা ও পথ পন্থা ইসলামের কুরআন হাদীছ ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন প্রণালী থেকে উৎসারিত। তাই তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি হলো ইসলামী। আবার কেউ কেউ তাসাওউফকে অনৈসলামিক বলে এর সবকিছুকে অস্বীকার করেন। বর্তমান বিশ্বের সালাফী ধারার আলিমগণ এ শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক বাহক। অধিকাংশ প্রাচবিদদের ন্যায় তারাও দাবী করেন যে, মুসলিম সমাজের তাসাওউফ অনৈসলামিক উৎস ও ভাবধ-ারা প্রসূত। এ বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য দুভাগে ভাগ করা যায়।

এক. মুসলিম সমাজে তাসাওউফ অনৈসলামিক উৎস প্রসূত হওয়ার প্রবক্তা

দুই. মুসলিম সমাজে তাসাওউফ ইসলামী উৎস প্রসূত হওয়ার প্রবক্তা

প্রথমত : তাসাওউফ অনৈসলামিক উৎস প্রসূত হওয়ার প্রবক্তা

মুসলমানদের মধ্যে তাসাওউফ বিরোধী একদল আলিম সহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত মনে করেন, মুসলিম সমাজের তাসাওউফের উদ্ভব মূল অনৈসলামিক প্রভাবে। যেমন: হিন্দুয়ানী ও বৌদ্ধ প্রভাব, পারসিক প্রভাব, গ্রীক ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রভাব, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়াদি থেকে মুসলিম সমাজে তাসাওউফের উৎপত্তি ঘটে।

বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ প্রভাব

এধরনের প্রভাবের কথা সর্ব প্রথম উচ্চারণ করেন আবু রায়হান আল বেরুনী (মৃ. ৪৪০হি.) তাঁর 'তাহকীক মা লিল হিন্দ মিন মাকুলাহ " (ভারততত্ত্ব) গ্রন্থে। তিনি মুসলিম সমাজের তাসাওউফ ও হিন্দুসন্যাসীদের জীবনাচার ও জীবন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে মিল খুজে পান। (আল শাফে'ঈ, ২০০৭খ্রি.: ১৫) একইভাবে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোনস, নিকলসন, ব্রাউন সহ কোন কোন পন্ডিতের ধারণা, মুসলিম চিন্তধারায় সূফীতত্ত্বের উৎপত্তি ঘটে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সংস্পর্শে এসে। বেদান্তের মত বৌদ্ধ দর্শনও সূফীতত্ত্বের চেয়ে প্রাচীনতর। (প্রাগুক্ত; Nichloson, 1967: 9; Brown, 1944,; Rahman, 1963:108; হক , ১৯৩৫খ্রি.: ২২৯।)

প্রাচ্যবিদদে মতে সূফীরা বৌদ্ধ চিন্তাধারা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতীয় চিন্তাধারায় এ জগত প্রাতিভাসিক, অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী ও অসাধ্যমূলক। এ নৈরাজ্যবাদী মনোভাব ও বৈরাগ্যবাদী জীবনাবরণ সেমেটিক মনে আবেদন সৃষ্টি করে। ফলে বৈরাগ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ সাহিত্য সুত্রে ভারতীয় ধারণাবলীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেক নেতৃস্থানীয় মুসলিম চিন্তাবিদ ভারতীয় চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা মেসোপটেমিয়ায় কিছু অনুসারীর সৃষ্টি করে। তাঁদের মতে, সূফী দর্শনের উদ্ভব ঘটে সেদিনের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রস্থল খোরাসানে এবং সে সূত্রেই ভারতীয় ধারণাবলী ইসলামে প্রবেশ লাভ করে। কেননা, সূফীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও নিয়ম-কানুনের সঙ্গে ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণাদির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ মতবাদ সূফীদের 'ফানা' (নিজ সত্ত্বাকে আল্লাহর সত্ত্বায় বিলোপ সাধন) ও বৌদ্ধদের 'নির্বাণে'র সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পারসিক প্রভাব

ই.জি ব্রাউন (E. J. Brown), রায়নান, ফ্রেডরিক দালটিস সহ কোন কোন প্রাচ্যবিদ মনে করেন, ইসলামে অতীন্দ্রিয় বা সূফী চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয়েছে পারসিকদের দ্বারা। (ড. হাসান শাফেঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮) তাঁরা আরবদের পারস্য বিজয়কে একটি উৎকৃষ্ট জাতির ওপর একটি অনুৎকৃষ্ট জাতির আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস বলে মনে করে থাকে। পারসিকগণ ছিল প্রধানত অগ্নি উপাসক এবং তারা যখন আরবদের শাসনে আসে, তখন তাদের মনে অহংকার বা আত্মগরিমা ছিল। যার পরিণতি লাভ করে অতীন্দ্রিয়বাদে। বস্তুতঃ পরবর্তী সূফীদের অধিকাংশেরই আর্বিভাব ঘটে পারস্য দেশে। তাঁরা সহজাত জ্ঞানের দিকে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। (Brown, 1964: 39, 54.) তাদের মতে মারুফ কারখী, বুস্তামী, হাল্লাজ, হাকীম তিরমিযী, সাহল আল তাসতারী, প্রমুখ সুফীগণ সকলই ছিল পারস্য এলাকার। ইরাকের বসরাও পারস্য সংলগ্ন তাই সুফীবাদ পারসিকদের যরস্ত্রু ধর্মের চিন্তাধারা প্রসুত। বিশেষত আধ্যাত্মিক কঠোর অনুশীলন, সন্নাসবাদ, ফানার ধার-ণাসমূহের সাথে পারসিক ধর্মের মিল রয়েছে।

খ্রিস্টান ও গ্রীক নিওপ্লেটোনিক প্রভাব

অধ্যাপক নিকলসন (মৃত ১৯৪৫ খ্রি.) জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলামে সূফী চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে খ্রিস্টান ও গ্রীক নিও প্লেটোনিক চিন্তাধারা থেকে। কারণ, মুসলমানগণ নিও পেণ্ঢটোনিক চিন্তাবিদ খ্রিস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসার ফলেই ইসলামে সূফী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। এ সব ভাববাদী চিন্তাশীল খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা হিজরী সালের কয়েক শতকের মধ্যেই খ্রিস্টীয় মতবাদ প্রচার কল্পে নবোদ্যোগে আরবের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্রই ঘুরে বেড়ান। (Nichloson, 1967: 11,-13; ঘোষ, ১৯৯২ খ্রি,: ৩৩।)

ত্রিবিধ মতবাদ পর্যালোচনা :

উপরোক্ত তিনটি মতবাদ কতটুকু যথার্থ, ইসলামে সূফী চিন্তধারায় এদের প্রভাব আছে কি না, থাকলে তার গভীরতা কতটুকু, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথমে দেখা যাক, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব সূফী চিন্ত-াধারায় কি প্রভাব ফেলেছে। যে সকল পন্ডিত ধারণা করে থাকেন যে, ভারতীয় বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে ইসলামের সূফী চিন্তধারা জন্ম নিয়েছে, তাঁদের ধারণা সত্য নয়। ভারতীয় অনুশাসন ও আচরণের সাথে মুসলমান সূফীদের জীবন পদ্ধতির কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে, এটা অনস্বীকার্য। এ সাদৃশ্য এটা প্রমাণ করে না যে, ভারতীয় চিন্তধারা থেকে ইসলামে সূফী চিন্তধারার উদ্ভব ঘটে। সূফী দর্শন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সূফী দর্শনের প্রকাশ ঘটে। এটা ইসলামের মতই পুরাতন। কাজেই বলা যায়, ভারতীয় ভাবধারা ইসলামে প্রবেশ করে সূফী চিন্তধারা উদ্ভবের অনেক পরে। অধ্যাপক নিকলসন (মৃ. ১৯৪৫ খ্রি.) তাই বলেছেন – 'The main currents of Inddian influence upon Islamic civiliza-tion belong to a letter epoch.' (Nichloson, 1967:.9.)

সাদৃশ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই দুটি দর্শনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বেদান্ত দর্শনের 'মায়াবাদ' ও সূফীদের 'জগত' সম্পর্কিত ধারণা এক নয়। সূফীগণ এ জগতের বাস্তবতা স্বীকার করে না। তারা এ জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। বেদান্তিকদের কাছে এ জগত অলীক হলেও সূফীদের নিকট এ জগত মূল্যবান। কেননা, এ জীবনের সাধনা পরজীবনের ভিত্তি রচনা করে। বেদান্তিকরা তাত্ত্বিক দিক থেকে জগতের অলীকতা স্বীকার করেন। কিন্তু সূফীরা নৈতিক দিক থেকে জগতকে প্রতিপন্ন করেন। যে ব্যক্তি আল্ল-াহকে পাওয়ার সাধনায় মোটেই অগ্রসর হতে পারল না, প্রবৃত্তির দাস হয়ে জীবন কাটাল, তার নিকট জীবন অসার, জগত অলীক; কিন্তু সূফীর নিকট তা নয়। সূফীগণ জীবন-জগতের আরাধনার মাধ্যমেই খোদার সান্নিধ্য লাভ করেন। আধ্যাত্মিক পুর"ষ যে শ্রেণিরই হোক না কেন, তাঁরা যে কোন বিলাস-ব্যাসন ও আরাম-আয়েসের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে পারেন না, তাঁরা যে সংযম ও কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন, তা শুধু সাধকদের মধ্যেই দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক এমন কি দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কের মধ্যেও দেখা যায়। (আলম, ১৯৯৪খ্রি. : ৩৭৮।)

সুতরাং বেদান্ত দর্শনের মায়ার পেলব বা ভারতীয় যোগীদের কৃচ্ছতা ও সংযম, মুসলিম মরমীবাদের প্রেরণা নয়। উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান, তা বাহ্যিক। বৌদ্ধদর্শন 'শূন্যবাদ' ও আত্মার নঞর্থে (Negative) বিশ্বাসী। বৌদ্ধ দর্শনে পরমতত্ত্ব বলতে শূন্যবাদকেই বোঝান হয়েছে। শূন্য একটা অনির্বচনীয় অবস্থা। 'অস্তি নাস্তি তনু ভয়ানু ভয়ে চতুষ্কোটি বিনি মুক্তির শূন্য রূপম' অর্থাৎ যা অস্তিত্ব নয়, অস্তি নাস্তি নয় এমনও নয়। অর্থাৎ এসব অবস্থার অতীতে যে অবস্থা তাকেই শূন্য রূপম নাম দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধদের 'শূন্যবান' দার্শনিক চিন্তার শেষ অবস্থা, বৌদ্ধরাও এর সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।(আব্দুর রশিদ, ২০১৫ খি, : ১০০)।

একজন সূফীর মাশুক পরম যাত পাক আল্লাহ চিরজীবী এবং দৃশ্য অদৃশ্য সবই তাঁর ব্যক্ত রূপ। সূফীর এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং তাঁর আল্লাহ্ তাই প্রকাশ (যাহির), অপ্রকাশ (বাতিন) সবই। (Rahman, 1963, : 109.) এদিক দিয়ে সূফীরা পরমতত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হয়েছেন। সূফীরা তাওহীদবাদী বিধায় এক আল্ল-াহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না। যদিও সূফী সাধনায় জড় জগত থেকে আধ্যাত্মিক জগতে উত্তরণের প্রয়াস আছে, যাতে গুণ (সিফাত) থেকে সত্তার (যাতে) স্বরূপে উপনীত হওয়া যায়। সে জন্যই তাঁদের এই প্রচেষ্টা। জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগতকে তারা একেরই বিবর্তন রূপ বলে মনে করেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ বেদান্তবাদীদের ন্যায় 'সু'-'কু' বা সত্য ও মিথ্যা বলে দুই পরাক্রমশালী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং জগতের একটা অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে আপনার নঞর্থক মুক্তি খোঁজেন। এজন্য তারা সংসার ত্যাগ করেন, কঠোর সংযত ব্রত পালন করেন এবং কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন। অন্যদিকে সূফীরা সংসার জীবন পালনের মাধ্যমে স্বাভাবিক সাধনা ও কৃচ্ছতা পালনের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের উর্ধ্বস্তরে উপনীত হন।

সূফীদের 'ফানা' এবং বৌদ্ধদের 'নির্বাণে'র সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলোচ্য মতবাদ। মতবাদ দুটির মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য কিছুটা থাকলেও এদের মধ্যে মৌলিক কোনও সাদৃশ্য নেই। সূফীদের 'ফানা' বৌদ্ধদের 'নির্বাণে'র মত কোন নঞর্থক অবস্থা নয়। ফানার পরে রয়েছে ইতিবাচক 'বাকা' বা আল্লাহতে স্থিতি। 'নির্বাণ'

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র বোধকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এরপর আর কোন স্তর নেই। 'ফানা' অবস্থায় সংশি- ষ্ট ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায়। এরপর আর কোন স্তর নেই। 'ফানা' অবস্থায় সংশি- ষ্ট ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায় ঠিকই; কিন্তু সে বিসর্জন শুধু আল্লাহর মধ্যে সমর্পিত হয়ে অসীমত্বে পৌঁছার লক্ষ্যে নিবেদিত। সমস্ত কামনা-বাসনা নির্বাপিত করাই নির্বাণ।

মানবের দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, জরা প্রভৃতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে একমাত্র তার দৈহিক ও মানসিক সর্ব প্রকার কামনা-বাসনাকে দূরীভূত করতে হবে, নিজকে জাগতিক ও বৈষয়িক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ধ্যানের মাধ্যমে অনন্ত শূন্যতার মাঝে আপনাকে বিসর্জন দিতে হবে। একেই নির্বাণ বলা হয়েছে। আত্মবিলয়ের মধ্যেই বৌদ্ধ মতে জীবের মুক্তি। এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু সূফীতত্ত্বে আত্মবিলোপের আরও একটি স্তর রয়েছে যার নাম 'বাকা' বা আল্লাহর স্থিতি।

এ স্তরের পূর্বেই বৌদ্ধগণ হারিয়ে যায় এক চেতনাহীন, বোধহীন অন্ধকার অমানিশায়। পক্ষান্তরে 'ফানা'র স্তরের পর 'বাকা'তে সূফীগণ খুজে পান নিজকে এবং এক গভীর অনুভূতিময় চৈতন্যে নিজের ব্যক্তিত্বের অসীমতাকে লাভ করে। অধ্যাপক নিকলসন (মৃত ১৯৪৫ খৃ.) বলেছেন :

> "We can not identify Fana with Nirvana unconditionally..... while Nirvana is purely negative Fana is accompanied by Baqaever, Lasting life in God.'' অর্থাৎ ''আমরা বিনা শর্তে 'ফানা' ও 'নির্বাণ'কে অভেদাত্মক বলে মেনে নিতে পারি না। নির্বাণ নিছক নেতিবাচক, কিন্তু 'ফানা' পরবর্তী স্তর 'বাকার' (আল্লাহর চিরন্তন সত্তায় অবস্থান) সাথে সম্পৃক্ত।' (Nichloson, 1967: 18.)
>
> ''এ কথা বলা যায় যে, সূফীতত্ত্বের নৈতিক আত্মা অনুশীলন' বৈরাগ্যবাদী উপাসনা প্রভৃতিতে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভূত প্রভাব রয়েছে। তবে এ দুটির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। মর্মের দিক থেকে এর মধ্যে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান। বৌদ্ধগণ নিজেদের নীতিসম্পন্ন করে তোলে, সেখানে একজন সূফী নীতি সম্পন্ন হয় কেবল আল্লাহকে জানা এবং তার মধ্যে বাস করার প্রয়াসে ..... ভারতীয় ধার-ণাবলীর মূল স্রোতসমূহ ইসলামে প্রবেশ করে সূফী দর্শনের উদ্ভবের বহু পরে।"(Nichloson, 1967: 9)

উপরোক্ত পর্যালোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে সূফী দর্শন ভারতীয় আমদানী নয়, সন্নাসপনায় কিছু মিল থাকলেই একটা আরেকটার উৎস বলা যায় না। ইসলামের যুহদ নীতিও আখেরাতমুখীকরণ ও দুনিয়া বিমুখতার প্রেরণা রয়েছে।

একইভাবে 'ইসলামের সূফী দর্শন পারসিক চিন্তাধারার প্রভাবজাত'- এ মতটিও অসার, অলীক। পারস্যবাদীদের মনের উপর রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও সহজাত মানসিক পবিত্রতার প্রভাব মরমী চিন্তাধারা বিকাশের সহায়ক হয়। সূফী দর্শনের বিস্তার ও উন্নতিতে পারস্যবাসীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে তারা

ইসলামের সূফী চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে, একথা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তাই অধ্যাপক নিকলসন (মৃত ১৯৪৫ খৃ.) প্রশ্ন তুলেছেন :

> "If sufism was nothing but a revlt of the Ariyan spirit, how are we to explain the undoubted fact that some of the leading pioneers of Mohummadan mysticism were natives of Syhria and Egypt and Arabs by race?'' (Nichloson, 1967 : 9.)

আল্লামা ইকবাল (র.) (মৃ. ১৯৩৮ খ্রি.) বলেন :

> 'No idea can seize peoples soul unless in some sense it is the peoples own' অর্থাৎ ''কোন ধারণাই কোন জাতির মনকে অধিক দিন ধরে রাখতে পারে না, যদি সে ধারণা তাদের নিজস্ব না হয়।'' (Iqbal , 1965: 76.)

পারসিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পারকিসগণ আর্যজাতি। তাদের প্রবণতা অর্ন্তমূখী। তাদের ধর্মমত, চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় একটা বিশেষ স্বকীয়তা বিদ্যমান। জাতি হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আরবরা স্রষ্টা সম্বন্ধে দ্বৈতবাদ অনুযায়ী সৃষ্টি-স্রষ্টা থেকে পৃথক এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের ন্যায়। পারস্যবাসীগণ এদিক দিয়ে একত্ববাদী। তাদের মতে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। আরবদের মতে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আরশে বসে এ জগত শাসন করছেন কিন্তু পারস্যবাসীদের ধারণা বিশ্বের সব কিছুর মাঝেই আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভূত হয়। আরবগণ প্রত্যক্ষবাদী, পারসিকগণ ভাববাদী। আরব-গণ বেশির ভাগই নৈতিক গুণে উদ্বুদ্ধ আর পারসিকগণ সাধারণভাবেই দার্শনিক ভাবধারায় বিভূষিত। (ফকির আবদুর রশিদ, **পূর্বোক্ত,** পৃ. ১০৫।) [৬৮]

ইসলামের সূফী চিন্তাধারার সাথে পারস্যবাসীদের সাদৃশ্য কিছুটা থাকলেও তাদের প্রভাবে সূফী দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে, এর কোন প্রমাণ নেই। পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সূফী দার্শনিকগণ পারসিক ছিলেন না, আরবী ভাষাভাষী ছিলেন, অথচ সূফী দর্শনে তারা শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষে অবস্থান করছেন। তারা মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও চারিত্রিক সংশোধনের যে নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, কুরআন হাদীছেও তার সমর্থন রয়েছে।

একইভাবে খ্রিষ্ট্রীয় সন্নাসবাদ সম্পর্কে বলা চলে এর দ্বারা সূফীগণ প্রভাবিত হননি। কারণ ইসলামের যুহদ নীতি, নাফসের মুহাসাবা (হিসাব নেয়া) ও চারিত্রিক নীতিমালা রয়েছে। ইসলামের সূফীবাদে খ্রিষ্টান ও নিউপ্লেটোনিকদের ত্রিত্ববাদ গৃহীত হয়নি। তবে সূফীবাদের চর্চায় বাড়াবাড়ি হয়নি সেটা দাবী করা যায় না। এক্ষেত্রে কিছু কিছু বাড়াবাড়ি রয়েছে। কিন্তু এটা প্রমাণ করে না যে মূল সূফীতত্ত্বটি অন্যধর্ম বা দর্শন থেকে নেয়া।

দ্বিতীয়ত : তাসাওউফ ইসলামী উৎস প্রসূত হওয়ার প্রবক্তা

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, কুরআন সুন্নাহে যুহদ ও তাযকিয়াতুন নাফস রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়সমূহ অনৈসলামিক নয়। পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, আল কুরআনে সরাসরি তাযকিয়াতুন নাফস ও আধ্যাত্মিক সফর বা প্রচেষ্টার কথা এসেছে। মনের হিসাব নেয়া তথা মুহাসাবাতুন নাফস এর কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وأولئك هم الفاسقون

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত তার নাসফ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য তার নাফস কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। তোমরা তাদের মত হইও না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিলেন; আর তারাই হল ফাসিক।" (সূরা হাশর : ১৮-১৯)।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،

তোমাদের হিসাব নেয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেরাই নিজেদের নাফসের হিসাব নাও।" (আত তিরমিযী, ১৯৯৮খ্রি. ৪: ২১৯, হাদীস ২৪৫৯)।

এমনিভাবে তাকওয়া ও পরহেযগারি অবলম্বন, যিকর আযকার, মুনাজাতে বেশী বেশী ক্রন্দন, আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে জীবন যাপন, বেশী তাওবাহ ইস্তিগফার ও নফল ইবাদাত ইত্যাদি বিষয়াদি কুরআন সুন্নাহে এসেছে। তাই তাসাওউফের মূলতত্ত্ব ইসলামেই রয়েছে। তবে তাসাওউফের ক্রমবিকাশ পর্বে পরবর্তীতে অনেক সূফী দরবেশ দেশী বিদেশী উপকরণ নিয়ে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনে চেষ্টা চালান। এরূপ মতবাদ হলো সর্বাত্মবাদ ও অনুপ্রবেশবাদের মতামতটি। যা ইসলামী নয়। এর সমর্থনে যে সব আয়াত উল্লেখ করা হয়, সেগুলোর বক্তব্যে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। এগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কারণ এ মতবাদসমূহ আল্লাহর সত্ত্বা, গুণাবলী ও কার্যাবলী এবং ইবাদাতের হক এর সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ আল কুরআনে স্পষ্ট আল্লাহ বলে দিয়েছেন: ১১ :الشورى] لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

তাঁর অনুরূপ কেউ নেই। তিনি শুনেন দেখেন।" (সূরা শুরা : ১১)। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্ট এক হতে পারে না। সুতরাং ঐ ধরনের মতবাদ সুফীবাদ বা যে নামেই হোক তা গ্রহণযোগ্য নয়।

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, তাসাওউফের প্রকৃতি ইসলামী। ইসলামী ভাবধারা থেকে এর উন্মেষ ও উৎপত্তি। হ্যাঁ, ক্রমবিকাশ পর্যায়ে কিছু কিছু মতবাদ তাসাওউফ তত্ত্বে প্রবেশ করেছে, যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু বিদেশী কিছু প্রভাব থাকলেও সেগুলোর বিষয়াদি কুরআন হাদীছে এসেছে। যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তবে যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সাংঘর্ষিক তা ইসলাম কখনো সমর্থন দেয় না। এজন্য এগুলো তাসাওউফের পরিধি ভুক্ত না করে কিছু সংখ্যক সুফীর মত হিসেবে দেখাই শ্রেয়। আর ইসলামের দৃষ্টিতে তাসাওউফের পরি-ধি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন ও চারিত্রিক সংশোধন উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্যবহৃত উৎসসমূহঃ

আত্তার, ১৪১১ বা
শেখ ফরীদউদ্দীন, ***তাযকিরাতুল আউলিয়া***, অনুবাদ শায়খুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক, (ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, চৌধুরী এন্ড সন্স, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪১১ বাং)

আনসারী, ১৪১০হি.
মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়া, ***শারহ আল রিসালাহ আল কুশায়রিয়্যাহ***, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি.,
আফিফী, ১৯৬৯ খ্রি.
আবুল আলা, ***ফী আত তাসাউফিল ইসলামী*** (কায়রো, ১৯৬৯ খ্রি.),
আলম, ১৯৯৪খ্রি. ড. রশিদুল , ***মুসলিম দর্শনের ভূমিকা***, (বগুড়া: প্রীতি প্রিন্টিং প্রেস, ৯৯৪খ্রি।)
ইমাম আহমদ, ১৪১৪ হি.
ইবন হাম্বল, ***মুসনাদে আহমাদ*** (বৈরূত : মুয়াসসাতুত্ তারীখিল আরাবী, দারু ইহয়াইত তুরাসিল ইসলামী১৪১৪ হি.)।
আব্দুর রশিদ, ২০১৫ খি,
ফকির, *সূফী দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫ খ্রি., পৃ.
ইবন আবদি রাব্বাহ, ১৪১১হি.
আল 'ইকদুল ফারীদ, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী ১৪১১হি.।
ইবন তাইমিয়া, ১৪০৩হি.
আল ইস্তিকামাহ, রিয়াদ : জামিআতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৩হি.।
আত তিরমিযী, , ১৯৯৮খ্রি
আবু ঈসা, *সুনান তিরমিযী*, বৈরূত : দারুল গারব আল ইসলামী , ১৯৯৮খ্রি.।
আল কারাদাভী, ১৯৮৩খ্রি.
ড. ইউসুফ, *ছাকাফাতুদ দা'ঈআহ*, দামিশক : মুআসসাসাতুর রিসালাহ,
আল-কুশায়রী, ১৯৮৯খ্রি.,
ইমাম আবুল কাসিম আল-কুশায়রী, *আর **রিসালাহ আল কুশায়রিয়া*** কায়রো : দারুশ শু'উব, ১৯৮৯খ্রি.)।
ইব্ন খালদুন, ১৯৮৮খ্রি.
আল মুকাদ্দিমা (বৈরূতঃ ইহইয়াউতু তুরাছিল আরাবী,)
আল ইসফাহানী, ১৯৯৭ খ্রি,
আবু নুআঈম, ***হিলয়াতুল আওলিয়া*** (বৈরূত : লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৭ খ্রি।
ঘোষ, ১৯৯২ খ্রি,
রামেন্দনাথ, ***মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু দর্শন*** (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.।
জিলানী, ২০০৬ খ্রি.
গাউসুল আজম বড়পীর হযরত আবদুল কাদির (রঃ), অনুবাদ একে,এম ফজলুর রহমান মুন্সী, ***গুনিআতুত তালেবীন***, (ঢাকা : তাজ কোম্পানী লিঃ ২য় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.)।
আত তাফতাযানী, তাবি,
ড. আবুল ওফা , *মাদখালুন ইলা আত তাসাওউফ আল ইসলামী*, কায়রো : দারুছ ছাকাফাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ৩য় সং, তাবি, পৃ.
আত তূসী, ১৯৬০খ্রি.
আবু নাসর আল সিরাজ, *আল-লুমা*, মিসর : দারুল কুতুব আল হাদীছাহ,
বখ্শ, ১৯৯৯ খ্রি.
হযরত দাতা গঞ্জ, *কাশফুল মাহযুব*, বঙ্গানুবাদ: মুহাম্মদ সিরাজুল হক, (ঢাকা : বাইতুল মুকাররম, ১৯৯৯ খ্রি.)।

আল-বুখারী , ১৯৮৫ খ্রি.
মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র.), *সহীহ আল-বুখারী* (মুখতার এ্যান্ড কোম্পানী , ১৯৮৫ খ্রি.)।
আল শাফে'ঈ, ২০০৭খ্রি.
প্রফেসর ড. হাসান ও ড. আবুল ইয়াযীদ আল 'আজামী, *ফি আল তাসাওউফ আল ইসলামী*, কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৭খ্রি.)।
সরকার ১৯৮৪ খ্রি.
মোঃ সুলাইমান আলী, *ইবনুল আরাবী ও জালালুদ্দীন রূমী*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.
হক , ১৯৩৫খ্রি.
মুহাম্মদ এনামুল, ***বঙ্গে সূফী প্রভাব*** (কলকাতা, ১৯৩৫খ্রি.)।
শায়খ ওয়ালী উদ্দীন ১৯৭৬খ্রি.
মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ, ***মিশকাতুল মাসাবিহ***, দিল্লী , ১৯৭৬খ্রি,
হুজুওয়াইরী, ১৪১২হি.
শায়খ কাশফুল মাহজুব, বৈরূত, ১৪১২হি.
Abdul Hai, 1982
Sayed, ***Muslim Philosophy*** (Dhaka, Isalamic foundation,)
Arberry, 1974, A.J. (ed),
Religion in the Middle East. Cambridge University Press ,1974)
Arberry, 1969,
A.J, *Sufism*, (London : 1969)
Brown, 1944,
E. J., ***The prospects of Islam***, (London, 1944), Chapter, Sufism
Brown, 1964,
E. J. A Literary Historty of Persia, Vol. 1-2, P. 110; Roice, The Parsian Sufism (London : 1964), p.
Deboar, 1961 ,
Dr. T. J., ***History of Philosophy in Islam***, (London 1961)
Iqbal , 1965,
Dr. Muhammad, ***The Dvelopment of Metaphysics in Persia*** (Lahore : Ashraf Press, 1965), p.
Nichloson, 1966
Dr. R. A.. ***The Mysticism of Islam***, Beirut-khayats 1966
Nichloson, 1967
`*Studies in Islamic Mysticism*; (Cambnridge : 1967)
Rahman, 1963
Saydur, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, (Dhaka: Mollik brothers, 1963) p.